যায়যায়দিন

তারিখ ... 16 JUN 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ...

কোচিংবাণিজ্য বন্ধের উদ্যোগ

অসম্পূর্ণতা থেকেই গেল

কয়দিন ধরে স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের নিয়ে নানা রকম বিস্তর অভিযোগ চলছিল। যে কারণে শিক্ষকদের ওপর অভিভাবক সমাজ ছিল প্রচণ্ড বিরূপ। সেটি হচ্ছে 'টিউশনি ব্যবসায়'। ভয়াবহ' যে অভিযোগটি, সেটা হলো ছাত্রছাত্রীদের এমন বাধ্য করা, যে বাধ্যবাধকতার অধীনে শিক্ষার্থীদের তার সাবজেক্টের ওপর 'কোচিং' বা 'প্রাইভেট' পড়তেই হতো, আরই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সেই শিক্ষকটির অধীনে, যিনি তার ওই সাবজেক্টটির শিক্ষক। অন্যথা হলে, পরীক্ষার খাতায় কম নম্বর পেতে হতো, কিংবা অকৃতকার্যও হতে হতো। ছাত্রছাত্রীদের ওপর চাপিয়ে দেয়া এই উপায়হীন বাধ্যবাধকতা বিগত প্রায় তিন দশক ধরে লাগামহীন চলে আসছিল। পত্রপত্রিকায় এ নিয়ে বিস্তর লেখালেখিও হয়েছে। কিন্তু যারা এসব অন্যায়-অবিচারের প্রতিকার করবেন বলে জনগণের প্রত্যাশা ছিল, তারা ছিলেন সে ব্যাপারে হয় নির্বিকার নয়তো শিক্ষকজোটের কাছে ছিলেন সীমাহীন অসহায়। কিন্তু সদিচ্ছা থাকলে যে সবই সম্ভব, আমাদের জনগণের সরকারের কেবিনেটে এমন দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী যথাযোগ্য ব্যক্তি খুব কমই অলঙ্কৃত হয়ে থাকেন।

অবশেষে, দীর্ঘদিনের ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের অভাব অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৪ জুন বৃহস্পতিবার 'শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের কোচিংবাণিজ্য বন্ধে নীতিমালা-২০১২' করল শিক্ষামন্ত্রণালয়। উল্লেখ্য, অভিভাবক ঐক্যফোরামের আহ্বায়ক জিয়াউল করিম দুলুর করা একটি রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত বছরের ১৭ অক্টোবর কোচিংবাণিজ্য বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছিলেন হাইকোর্ট।

শিক্ষামন্ত্রণালয়ের নানা প্রশংসনীয় উদ্যোগের মধ্যে এটিও আরেকটি সংযোজন হতে পারে। এই নীতিমালায় 'কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক নিজ শিক্ষার্থীদের কোচিং বা প্রাইভেট পড়াতে পারবেন না'। তবে একটা বিষয়েই যত খটকা। সেটা হলো, এই নীতিমালার অধীনে কোচিং বা প্রাইভেট না পড়াতে পারলেও 'অভিভাবকদের সম্মতিতে' 'নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা' নিয়ে সে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভিতরেই 'অতিরিক্ত ক্লাস' নেয়া। এই পদ্ধতি তো দেশের বহু স্কুলে অনেক আগে থেকেই চলে আসছিল। নীতিমালায় আরো একটি অনুমোদন রয়েছে, সেটি প্রতিষ্ঠান প্রধানের কাছে প্রতিবেদন সাপেক্ষে শিক্ষকরা চাইলে দিনে অন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ১০ জন শিক্ষার্থীকে বাড়িতে পড়াতে পারবেন।'

এই নীতিমালার উদ্দেশ্য মনে হয় শিক্ষকদের যে 'কোচিং ব্যবসা' চলে আসছিল যথেচ্ছভাবে, সেটারই একটু 'আমলাতান্ত্রিক লাগাম' টেনেটুনে ধরা। তারা 'কোচিং বাণিজ্য' করবেন, ঠিক আছে, তবে এই নীতিমালার মধ্যে থেকে করতে হবে। তাহলে এখানে 'নৈতিকতা'র প্রশ্নটি গেল কোথায়? 'নির্দিষ্ট অঙ্কে' এবং 'অভিভাবকদের অনুমতি সাপেক্ষে', প্রাপ্ত টাকার ১০ শতাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আনুষঙ্গিক খরচ মেটানোর উদ্দেশ্যে প্রদান; এরকম শর্তাদিতে যে 'কোচিংবাণিজ্য' হবে, সেটা কে কীভাবে তদারকি করবে? নাকি আদৌ সম্ভব হবে? আর সব অভিভাবকদের উপার্জন তো একই স্ট্যান্ডার্ডের নয়। 'নির্দিষ্ট অঙ্ক' বলে যা ধরা আছে, সে 'নির্দিষ্ট অঙ্কের' 'মানদণ্ড'টি কীভাবে বিবেচিত হবে? দেখা যাচ্ছে এখানে যেভাবে জেলা, উপজেলা, এলাকাভিত্তিক 'টাকার অঙ্ক' কষা হয়েছে (মহানগরী ৩০০ টাকা, জেলা ২০০ টাকা, উপজেলা এলাকা ১৫০ টাকা), সেটা কি অভিভাবকদের আয় ও বাসস্থানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে করা নাকি মহানগরী, জেলা, উপজেলা বা এলাকার গুণগত পার্থক্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে করা? কোনটা? অনেক অভিভাবক আছেন, মহানগরীতে থাকেন ঠিকই, কিন্তু তাদের মাসিক আয় হয়তো উপজেলা পর্যায়ে আছেন এমন অনেকের চাইতে কম। আবার উল্টোটাও অনেক। বড় প্রশ্ন হচ্ছে, হাইকোর্ট যেখানে 'কোচিংবাণিজ্য বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা' নিতে বলেছেন, সেটাই একটা 'নীতিমালার অধীনে' কতকটা গ্রহণ ও বর্জনের মধ্য দিয়ে 'কোচিংবাণিজ্য'টিকে একটা নিয়মতান্ত্রিক বৈধতাই দেয়া হলো না?

> এই নীতিমালার উদ্দেশ্য মনে হয় শিক্ষকদের যে 'কোচিং ব্যবসা' চলে আসছিল যথেচ্ছভাবে, সেটারই একটু 'আমলাতান্ত্রিক লাগাম' টেনেটুনে ধরা।